নবম অধ্যায়

শূন্যের চূড়ান্ত বিজয়

[শেষ সময়]

এভাবেই ধ্বংস হবে বিশ্ব

বিস্ফোরণের মাধ্যমে নয়, কান্নার মাধ্যমে।

—টি এস এলিয়ট, “দ্য হলো ম্যান”

কিছু কিছু পদার্থবিদ সমীকরণ থেকে শূন্যকে বাদ দিতে চেষ্টা করছেন। অন্যরা আবার দেখাচ্ছেন, শূন্যই হয়ত হাসবে শেষ হাসি। বিজ্ঞানীরা হয়তো কোনোদিনই মহাবিশ্বের জন্মরহস্য জানবেন না। তবে মহাবিশ্বের মৃত্যু সম্পর্কে প্রায় জানা হয়ে গেছে। মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি আছে শূন্যের হাতেই।

আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় সমীকরণে স্থির ও পরিবর্তনশীল মহাবিশ্বের স্থান নেই। তবে আরও বেশ কিছু পরিণতির সুযোগ আছে। এগুলো নির্ভর করে মহাবিশ্বের ভরের পরিমাণের ওপর। মহাবিশ্ব হালকা হয়ে থাকলে স্থান-কালের বেলুন প্রসারিত হতেই থাকবে। বড় থেকে আরও বড় হতেই থাকবে। নক্ষত্র ও ছায়াপথ একের পর দপ করে নিভে যাবে। মহাবিশ্ব হয়ে যাবে শীতল। হবে তাপীয় মৃত্যু। তবের ভর বেশি হলে আবার ভিন্নকথা। নক্ষত্র ও ছায়াপথের দল ও অদেখা ডার্ক ম্যাটার ঠেকিয়ে দেবে বিগ ব্যাংয়ের প্রাথমিক ধাপ। বেলুনের স্ফীতি চলবে না চিরন্তন। ছায়াপথরা একে অপরকে কাছে টেনে নেবে। শেষ পর্যন্ত স্থান-কালের কাঠামো কাছাকাছি হয়ে আসবে। বেলুন চুপসে যেতে শুরু করবে। এ প্রক্রিয়া ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর হবে। মহাবিশ্ব ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত এর সমাপ্তি ঘটবে পেছনমুখী বিস্ফোরণ দিয়ে। যার নাম মহাসঙ্কোচন (big crunch)। আমাদের ভাগ্য কোনটা আছে? মহাসঙ্কোচন, নাকি তাপীয় মৃত্যু? উত্তর চলে এসেছে হাতে।

দূরের ছায়াপথের দিকে তাকালে অতীত দেখা যায়। ধরুন, কাছের কোনো ছায়াপথ আছে ১০ লাখ আলোকবর্ষ দূরে। ঐ ছায়াপথ থেকে বের হওয়া আলো পৃথিবীতে আসতে ১০ লাখ বছর সময় লাগবে। আমরা যে আলো এখন দেখব, তা ছায়াপথ থেকে বের হয়েছে ১০ লাখ বছর আগে। আরও দূরের বস্তুর দিকে তাকালে দেখা যাবে আরও দূরের অতীত।

মহাবিশ্বের পরিণতি নির্ভর করছে স্থান-কালের বেলুনের প্রসারণের গতির ওপর। প্রসারণ দ্রুত কমে গেলে বোঝা যাবে বিগ ব্যাংয়ের সময় সৃষ্টি শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। মহাবিশ্ব এগিয়ে যাবে মহাসঙ্কোচনের দিকে। আর প্রসারণ খুব বেশি না কমলে বোঝা যাবে বিগ ব্যাংয়ের শক্তি স্থান-কালের কাঠামোকে সজোরে ধাক্কা দিয়েছিল। যার ফলে প্রসারণ চলবে চিরকাল।

জ্যোতির্বিদরা মহাবিশ্বের প্রসারণের পরিবর্তন পরিমাপ শুরু করেছেন। টাইপ-ওয়ান এ নামে এক ধরনের সুপারনোভা (বিস্ফোরিত তারা) আছে। এরাও হাবলের সিফিড তারাদের মতো আদর্শ বাতি হিসেবে কাজ করে। এ সুপারনোভারা প্রায় একইভাবে বিস্ফোরিত হয়। উজ্জ্বলতা থাকে একইরকম। হাবলের অনুজ্জ্বল সিফিড তারার সাথে এদের পার্থক্য আছে। এদেরকে পুরো মহাবিশ্বের অর্ধেক দূরত্ব পর্যন্ত দেখা যায়।

১৯৯৭ সালে এল আরেক বিশেষ আবিষ্কার। জ্যোতির্বিদরা এ সুপারনোভাগুলো দিয়ে বেশ কিছু অনুজ্জ্বল ও প্রাচীন ছায়াপথের দূরত্ব পরিমাপ করেন। ছায়াপথের দূরত্ব এর বয়সও বলে দেয়। আর এর ডপলার সরণ বলে দেয় এর বেগ। অতীতের বিভিন্ন সময়ের ছায়াপথের দূরে সরার গতির তুলনা করলেন বিজ্ঞানীরা। এর মাধ্যমে জানা গেল স্থান-কালের প্রসারণ বেগ। আর সেটা খুবই অদ্ভুত এক ফল।

মহাবিশ্বের প্রসারণ থামছে না। প্রসারণ বেগ বরং সম্ভবত বেড়ে যাচ্ছে। সুপারনোভার উপাত্ত বলছে, মহাবিশ্ব ক্রমেই বেশি দ্রুত হারে বড় হচ্ছে। এটা সঠিক হয়ে থাকলে মহাসঙ্কোচন ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মহাকর্ষের বিপরীতে কাজ করছে কোনো একটি বল। পদার্থবিদরা আবারও ফিরে গেলেন মহাজাগতিক ধ্রুবকের কাছে। যে ধ্রুবক আইনস্টাইন যোগ করেছিলেন তাঁর সমীকরণে মহাকর্ষের ধাক্কাকে ভারসাম্যে আনতে। আইনস্টাইনের সবচেয়ে বড় ভুলটি হয়ত ভুলই ছিল না।

রহস্যময় সে হয়ত আবারও সেই ভ্যাকুয়াম। স্থান-কালের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণারা হয়ত ধাক্কা দিচ্ছে বাইরের দিকে। অননুভবযোগ্যাভাবে প্রসারিত করে দিচ্ছে স্থান-কালের কাঠামোকে। বহু কোটি বছরে সে প্রসারণ জমা হয়ে মহাবিশ্বকে দ্রুত থেকে দ্রুততর স্ফীত করছে। মহাবিশ্বের পরিণতি মহাসঙ্কোচন নয়। বরং চিরপ্রসারণ, শীতলায়ন ও তাপীয় মৃত্যু। আর এর জন্য দায়ী শূন্য-বিন্দুর শক্তি। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার যে শূন্য ভ্যাকুয়ামকে অসীমসংখ্যক কণা দিয়ে ভর্তি করে দেয়।

জ্যোতির্বিদরা এখনও সাবধানে পা চালাচ্ছেন। সুপারনোভা থেকে প্রাপ্ত এ ফল থেকে প্রাথমিক একটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। প্রতিটি পর্যবেক্ষণ শেষে এ সিদ্ধান্ত আরও জোরালো হচ্ছে। কিছু গবেষণায় আবার নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে গ্যাসের চূড়া বা মহাকর্ষীয় বক্রতার সংখ্যা দেখা হয়। সেসব পর্যবেক্ষণ থেকেও সুপারনোভার ফলাফলের পক্ষে সমর্থন পাওয়া গেছে। ফলে মনে হচ্ছে মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হবে। মৃত্যুটা হবে শীতল, উষ্ণ নয়।

পরিণতি হবে হিম, আগুন নয়। আর এর কৃতিত্ব শূন্যের।

অসীম ও তার ওপারে

একটি একীভূত তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হলে সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝার উপযোগী হতে হবে। শুধু কিছু বিজ্ঞানীকে বুঝলেই চলবে না। তখন বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং সাধারণ মানুষ- সবাই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। এর উত্তর পেলে তবেই তা হবে মানুষের বুদ্ধির জগতের চূড়ান্ত বিজয়। কারণ তখনই আমরা ঈশ্বরের মন (mind of God) জানতে পারব।

—স্টিফেন হকিং

পদার্থবিদ্যার সব ধাঁধাঁর জন্য দায়ী শূন্য। ব্ল্যাকহোলের অসীম ঘনত্বে আছে শূন্য দিয়ে বিভাজন। শূন্যতা থেকে বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে সৃষ্টিতেও আছে শূন্য দিয়ে ভাগ। শূন্য দিয়ে ভাগ আছে ভ্যাকুয়ামের অসীম শক্তিতে। তবুও শূন্য দিয়ে ভাগ করলে গণিতের কাঠামো ধ্বংস হয়ে যায়। ভেঙে চুরমার হয় যুক্তির পাটাতন। বিজ্ঞানের ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার যোগাড়।

পিথাগোরাসের যুগে রাজত্ব করত বিশুদ্ধ যুক্তি। তখনও শূন্যের জন্ম হয়নি। মহাবিশ্ব ছিল সুশৃঙ্খল ও অনুমানযোগ্য। এর ভিত্তি ছিল মূলদ সংখ্যা। জেনোর গোলমেলে প্যারাডক্সগুলোকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অসীম ও শূন্যকে সংখ্যার জগত থেকে বাদ দেওয়া হয়।

এরপর এল বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। বাস্তব অভিজ্ঞতার কাছে হার মানল বিশুদ্ধ যুক্তি। দর্শনের স্থান দখল করল পর্যবেক্ষণ। মহাবিশ্বের সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউটনকে উপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁর ক্যালকুলাসের কুযুক্তি। যে কুযুক্তির জন্ম দিয়েছিল শূন্য দিয়ে বিভাজন।

ক্যালকুলাসের শূন্যের ভাগ তো গণিতবিদ ও পদার্থবিদরা সমাধান করলেন। পুনরায় একে যুক্তির ভিত্তির ওপর দাঁড় করালেন। কিন্তু শূন্য ফিরে এল কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা ও সার্বিক আপেক্ষিকতার সমীকরণে। আবারও বিজ্ঞানকে কলুষিত করল অসীম দিয়ে। মহাবিশ্বের শূন্যে যুক্তি হার মানে। ভেঙে পড়ে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা ও সার্বিক আপেক্ষিকতা। এটা সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আবারও শূন্যকে নির্বাসনে পাঠানোর অভিযানে নামেন। মহাবিশ্বের সূত্রগুলোকে জোড়া দিতে চাইলেন।

বিজ্ঞানীরা এ কাজে সফল হলে বুঝতে পারবেন মহাবিশ্বের সূত্রগুলো। স্থান-কালের প্রান্তসীমা পর্যন্ত সবকিছুর নিয়ন্ত্রক সূত্রগুলো তখন জানব আমরা। জানব মহাবিশ্বের সূচনা ও সমাপ্তির গল্প। জানব, কোন পরিস্থিতিতে জন্ম হয়েছিল মহাবিশ্বের। আমরা জানব ঈশ্বরের মন। তবে এবার আর শূন্যকে হারানো এত সহজ নাও হতে পারে।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা ও সার্বিক আপেক্ষিকতাকে জোড়া দেওয়ার বেশ কিছু তত্ত্ব আছে। এগুলো ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্র ও বিগ ব্যাংয়ের সিংগুলারিটির ব্যাখ্যা দেয়। তবে এ তত্ত্বগুলো বাস্তব পরীক্ষাযোগ্যতা থেকে যোজন যোজন দূরে আছে। এদের কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তা জানা সম্ভব নাও হতে পারে। স্ট্রিং তত্ত্ব ও কসমোলজিস্টদের বক্তব্য হয়ত গাণিতিকভাবে নির্ভুল। আবার একইসাথে হতে পারে পিথাগোরাসের দর্শনের মতো মূল্যহীন। গাণিতিকভাবে এগুলো দেখতে সুন্দর ও সুসঙ্গত হতে পারে। সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাও করতে পারে মাহবিশ্বের বৈশিষ্ট্যকে। তারপরেও হতে পারে পুরোদস্তুর ভুল।

বিজ্ঞানীরা শুধু জানেন, মহাবিশ্ব এসেছে শূন্য থেকে। আবার ফিরেও যাবে শূন্যে। যেখান থেকে এটি এসেছে।

শূন্য দিয়েই শুরু ও শেষ মহাবিশ্বের।